ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 103-110
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.185

নারী চেতনার আলোকে মহাকালের নারী: প্রসঙ্গ মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা

ড. রেজাউল ইসলাম, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.08.2025; Accepted: 26.08.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Mallika Sengupta's poetry highlights the struggles of marginalized and neglected women in a patriarchal society. She uses mythological and historical female figures such as Draupadi, Sita, Ganga, Kunti, and Khana, as well as contemporary women like Medha Patekar, Shah Bano, and Malati Mudi, as subjects in her poems. The poet breaks down conventional myths and portrays these women as rebellious, brave, and independent.

In her writing, these characters not only protest the injustices done to them but also demand their rights as 'human beings' equal to men. Mallika's poetry is a feminist manifesto, vocal against the oppression of women and a strong message for women's empowerment. She believes that every woman possesses the strength of the ten-armed Durga, which is enough to live life on her own terms.

Over time, these women have become symbols of the independent woman of the twenty-first century. These female characters find new life through Mallika's pen, and through their self-expression, the poet proves that the stream of women's struggle has been flowing in the same way for thousands of years. This reflection of a rebellious spirit is the core success of Mallika Sengupta's poetry.

Keywords: Feminism, Patriarchy, Mythological figures, Sita and Draupadi, Rebellious woman, Independent-minded, social context, Post-modern, Empowerment/Capability, Durga

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যা-কিছু প্রান্তিকায়িত, পরিত্যক্ত, অবাঞ্ছিত, স্থানচ্যুত, প্রত্যাখ্যাত, অধিকার-শূন্য ও বহিষ্কৃত – সেই সব অপরের মধ্যে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করার মাধ্যমেই আধুনিকোত্তর নারীবাদের বিনির্মাণ ভাবনার সূত্রপাত। সমাজতাত্ত্বিক মল্লিকা সেনগুপ্ত (১৯৬০-২০১১) পৌরাণিক যুগ থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক এবং বর্তমান যুগের অজস্র নারীর আত্ম-বলিদানের ঘটনা-পরম্পরা নিবিড় ভাবে পর্যালোচনা করে তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে তুলে ধরেন অনিবার্যভাবে। পূর্বনারীদের আত্মবলিদানের কারণ অনুসন্ধানের পাশাপাশি তাঁদের অপ্রকাশিত কথা বলতে গিয়ে মল্লিকার লিখনবিশ্বে ভিড় করেছে দ্রৌপদী, গঙ্গা, কুন্তী, খনা, রেণুকা, আম্রপালী, তুতানখামেনের মা, চিত্রাঙ্গদা, মাধবী, সীতা, সুলতানা রাজিয়া, মীরাবাঈ মেধা পাটেকর, শাহবানু, মালতী মুদি, রূপকানোয়ার প্রমুখ মহাকালের নারীরা। মহাকালের নারীপ্রতিমা প্রতিটি কালেই অপরিবর্তিত রয়েছে বাহ্যিক মুখোশের আড়ালে। অর্থাৎ, আধুনিক মেয়েদের পত্নপ্রতিমা রূপে মল্লিকার নারীরা পুরুষতান্ত্রিক চোরাবালির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গড়ে তুলেছে প্রতিরোধের প্রাচীর—

> "হে পুরুষ, হে আবহমানের সঙ্গী, যদি জিজ্ঞেস করো, তোমার কাছে কী ব্যবহার আশা করি, আমি বলব মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার, যেরকম পুরু বলছিলেন আলেকজান্ডারকে, রাজার সঙ্গে রাজার ব্যবহার, তোমরা আমাদের ভালবেসেছ, পীড়ন করেছ, মানুষ কিন্তু ভাবোনি, আমি তো প্রতিবাদ করবই। তখনও করেছিলাম, সেই যখন আমার নাম ছিল কৃষ্ণা, দৌপদী, যজ্ঞসেনী..."[১]

নারীচেতনার স্বরকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত কালের জটিল প্রবাহে তলিয়ে যাওয়া হাজার হাজার বছরের ভস্মের মধ্যে নারী নামক চাপা আগুনকে প্রজ্জ্বালিত করেছেন তাঁর কবিতায়। আধুনিকোত্তর সময়ে নারীর নিজস্ব পরিসর নির্মাণে এই নারীরা খুঁজে নিতে চেয়েছে 'মানুষ' শব্দে তাদের সম অধিকার। ছাব্বিশ বছরের সাহিত্যজীবনে কবি বাংলা সাহিত্যের পাঠকে উপহার দিয়েছেন- আঠারোটি কবিতার বই, তিনটি ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টির আলোকে তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থ। কবি পুরাণ-ইতিহাসে মিথ হয়ে যাওয়া নারীচরিত্রদের পাশাপাশি সমকালের ব্যতিক্রমী নারীদেরও তুলে ধরেছেন প্রথাগত স্রোতের প্রতিকূলে। নারীচরিত্রের প্রতিনিধিস্থানীয় কথামানবীর আত্মবয়ানে একদিকে যেমন চিত্রিত হয় পুরুষতান্ত্রিক নির্মমতা অন্যদিকে উত্তরকালের নারীর জন্য নির্মিত হয় আরেক মানবিক পৃথিবী। মহাকালের এই নারীরা নিজের 'আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে'র তকমা বারবার ভুল প্রমাণ করেছেন মল্লিকার কলমে।

'রামায়ণে'র কাহিনী আমরা সকলেই জানি এবং আমাদের সমাজে আজও সীতা ভারতীয় নারীত্বের উজ্জ্বল মিথ। পুরুষতন্ত্রের জটিল আবর্তে একজন অসহায় নারীকে পুরুষ লেখকের কলমে নারীচরিত্রের রোলমডেলে পরিণত করার দ্বিচারিতা আর বোধহয় অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া মুসলিক। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে বিভেদকামী কিছু রাজনৈতিক দলে যখন 'রামরাজ্যে'র স্বপ্ন দেখায় তখন কবি 'রামরাজ্যে' বসবাসকারী নারী ও শূদ্রদের অবস্থান স্পষ্ট করে, প্রচলিত মিথের বাড়াবাড়িকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে আধুনিক পাঠকের কাছে ছড়িয়ে দিয়েছেন যুক্তি-পরম্পরার সুতীব্র আঘাতে। প্রথাবদ্ধ সংস্কারের মর্মমূলে আঘাত করে প্রতিষ্ঠিত করতে চান অকৃত্রিম মানবতার। যুগ যুগ ধরে চলে আসা রামরাজ্য, রাম-সীতা, রাবণ প্রভৃতি চরিত্রের সমন্বয়ে সাজানো পুরুষতান্ত্রিক আয়ুধ—মল্লিকার কবিতায় পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে প্রচলিত মিথের অচলায়তন-

"ভারতের গ্রামে গ্রামে আজও হনুমান
করজোড়ে গলবস্ত্রে প্রার্থনা করেন
উঁচুজাতিদের চাপে শূদ্র হত্যা করেন যে রাজা
এবারের নির্বাচনে তাকে ভোট দিন
চোদ্দোটা বছর যিনি স্ত্রীপুত্রের দায়িত্ব না নিয়ে
কাটালেন, নির্বাচনে তাকে দিন দেশের দায়িত্ব"[২]

কবি তাঁর কবিতাবিশ্বে সীতাকে মৌন রাখলেও 'সীতায়ন' উপন্যাসে সীতাকে আধুনিক নারীচেতনার অন্যতম মুখ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। রামের রাজসভায় দাঁড়িয়ে রামের চোখে চোখ রেখে মল্লিকার সীতা দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করতে পারে—

> "রাজার ভূষণ যে প্রজানুরঞ্জন, যার জন্য আমাকে পরিত্যাগ করেছিলেন দশরথপুত্র, সেই কর্তব্যবোধ কোথায় ছিল যখন নিরীহ এক শূদ্রকে শুধুমাত্র তপশ্চর্যার জন্য ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় হত্যা করেছিলেন? শূদ্র কি প্রজা নয়? নারী কি প্রজা নয়? বাঃ ধিক্ এই রাজ আদর্শে, ধিক্ রামরাজ্যে। ...এই শপথ নিতে আমার ঘৃণা হচ্ছে। শপথ নিলেই কি আমার শরীর অপাপ হবে! ...বিবশ অবস্থায় রাবণ যদি আমার অঙ্গ স্পর্শ করেও থাকে -সে পাপ আমার নয়..."[৩]

'মহাভারতে'র কালে নারী-স্বাধীনতার যোগ্য উদাহরণ হিসেবে দ্রৌপদী, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা, চিত্রাঙ্গদা, কুন্তীর প্রসঙ্গ সচরাচর আসে। একথা স্বীকার করতেই হয় ক্ষত্রিয় মহাকাব্যে নারী ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র স্বীকৃতি আছে। কালক্রম ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের পরিমান মূল 'মহাভারতে' দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি হওয়ার ফলে যাবতীয় 'নেগেটিভিটি'র দায় বর্তায় নারীর উপরে এবং সমান্তরালে চলে নারীত্ব নির্মাণের খেলা। সমালোচকদের মধ্যে অনেকে এটাও দাবী করা হয়ে থাকেন যে, দ্রৌপদীর সামান্য একটি কথাই নাকি মহাভারতের গৃহযুদ্ধের মূল কারণ।

পুরুষতান্ত্রিক আবহে পরিবেশিত মহাভারতের নারীরা অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ী হওয়া সত্ত্বেও প্রতিমুহূর্তে জেন্ডার বায়াসে জর্জরিত। মল্লিকা তাঁদের জন্য উপযুক্ত পরিসর দিয়েছেন তাঁর সমগ্র কবিতায়। তিনি এঁদের হয়ে সমাজ-সংসারের কাছে উন্মোচন করেন আবহমান কালের নারী কণ্ঠস্বর–

"হস্তিনাপুরের এক গৃহবধূ, সেই আমি আবার জন্মেছি
ভারতবর্ষের দিকে যে মেয়েটি এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিল–
স্ত্রীকে পণ রাখবার অধিকার কে দিল স্বামীকে?
...তোমরা পুরুষজন, বাঁ হাতে নারীকে ঠেলে আন্দরে পাঠাও
ডান হাতে তোমরাই গা থেকে কাপড় টেনে খুলে নাও উন্মুক্ত বাজারে
তোমরা বিধান দাও, তোমরাই বোবা হয়ে থাক
পুরুষে পুরুষে যুদ্ধ, প্রতিশোধ রমণীর শ্লীলতাহানিতে।
...হে পুরুষ!
রূপ দেখলেই কেন হাতের মুঠোয় চাও জ্যান্ত মানবীকে!
না পেলে তারই শাড়ি টেনে ধরে অশ্লীল হাসিতে
তাঁর মুখ কালো করে দিতে চাও। বলো –
দ্রৌপদীর বহু পতি, বেশ্যা অতএব"[৪]

মহাভারতের কালে দ্রৌপদী পুরুষতান্ত্রিক এই ব্যভিচারকে নিয়তি বলে মেনে নিলেও মল্লিকার দ্রৌপদী উপযুক্ত জবাব দিয়ে পুরুষতন্ত্রের জগদ্দল পাথরকে সজোরে আঘাত করেছে–

"আমি যদি বেশ্যা হই, তুমিও পুরুষ বেশ্যা কর্ণ মহামতি!
তোমারও শয্যায় আসে বহু পত্নী বিবিধ স্ত্রীলোক
তুমি যে নিয়মে চলো সে নিয়মে অধিকার আমারও থাকুক"[৫]

যযাতি-কন্যা মাধবীর অমানবিক আখ্যান আমরা সকলেই জানি। আটশত ঘোড়ার বিকল্প হিসেবে যযাতি তার মেয়ে মাধবীকে তুলে দেন ঋষি গালবের হাতে। আর গালব পর্যায়ক্রমে তিনজন নৃপতির হাতে মাধবীকে দু'বছরের শুল্ক হিসেবে তুলে দেন। এমনকি যযাতির স্বর্গে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পুণ্য-সূচক কম ছিল বলে মাধবীর সঞ্চিত পুণ্যের একটি অংশ নিয়ে স্বর্গে প্রবেশের ছাড়পত্র অর্জন করেন। সমকালের প্রেক্ষাপটে তাকিয়ে কবির যাথার্থ উচ্চারণ আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক–

"একমুঠো চালের জন্য বা এক কোটি বাণিজ্যের জন্য আজও প্রেমিকাকে বাজি রেখে জুয়াখেলা চলে।"[৬]

পিতৃতন্ত্র নামক দর্শনের অমানবিক আচরণবিধিকে দায়ী করে 'মাধবীজন্ম' ও 'মাধবীর গান' কবিতায় মল্লিকা নির্মাণ করেছেন এযুগের মাধবীদের। আমাদের মনে পড়ে গ্রিক পুরাণে উল্লিখিত দৈবজ্ঞদের নির্দেশে পিতা অ্যাগামেমনন কর্তৃক কিশোরী কন্যা ইফিগেনাইয়ার বলি দেওয়ার কথা। এজন্য মল্লিকার কবিতায় আধুনিক মাধবীরা নারীচেতনাবাদের ঢঙে বলে যেতে পারে নিজের অভিশপ্ত অতীতের কথা–

"রাজার কন্যা মাধবী
জন্মেছি আমি অতীতে
আমাকে বিক্রি করেই পিতা ও প্রেমিক
ধর্ম অর্থ মোক্ষ নিয়েছে জিতে
তোমাদের কাছে শোনাতে এসেছি আজকে
অদ্ভুত গালব মাধবী কাহিনী।"[৭]

নদীমাতৃক ভারতবর্ষের প্রধান নদী গঙ্গা– এদেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের প্রধান সহায়। পুরাণে বর্ণিত 'সান্তনু-গঙ্গা' আখ্যান এবং জীবকূলের মঙ্গলার্থে গঙ্গার মর্ত্যে আগমন বৃত্তান্ত আমরা সকলেই জানি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আধুনিকতার বিষবাষ্পে জর্জরিত আজকের গঙ্গা হারিয়েছে তার জৌলুষ। পুরুষতান্ত্রিক ঔদ্ধত্য ও ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী

মনোভাবে বলি হয়ে যাওয়া গঙ্গা মল্লিকার কলমে এমনভাবে চিত্রিত যেন আমাদের ঘরের মেয়ে গঙ্গা তার প্রবাহমান যাপনের কথা বলে চলেছে-

"গঙ্গা তোমার কন্যা, যাকে রোজ
চাবুক মারা হয় শ্বশুরঘরে
গঙ্গা তোমাদের জননী রোজ যার
পায়ের তলা থেকে জমিটা সরে যায়
গঙ্গা তোমাদের ঘরনি, যাকে ঘর
ছাড়তে হয় স্বামী পুত্র ফেলে রেখে।"[৮]

পুরাণের হাত ধরে মল্লিকা চলে গেছেন সমকালীর ব্যতিক্রমী নারীদের কাছে। এরকম পরিস্থিতিতে কবি স্মরণ করেন একমাত্র ব্যতিক্রমী মহীয়সী মেধা পাটেকরকে যিনি মহাবাঁধ প্রকল্পে উৎখ্যাত হওয়া হাজারো মানুষের পুনর্বাসনসহ একাধিক দাবীতে লড়াই চালিয়ে যান জগদ্দল পাঠরের বিরুদ্ধে। কালের প্রবাহমানতায় পুরাণ ও সমকাল অভিন্ন হয়ে দেখা দেয় মল্লিকা আহ্বানে—

"তোমাকে চাই আমি হে মেধা পাটেকর
সবুজ নারী তুমি আমার হাত ধরো
নতুন গঙ্গার জন্ম দাও।"[৯]

এভাবেই কুন্তী, রেণুকা, চিত্রাঙ্গদা-রা নবজন্ম লাভ করে মল্লিকার কবিতায়। ঋষি জমদগ্নির স্ত্রী তথা পরশুরামসহ পাঁচ সন্তানের জননী রেণুকা, সামান্য মানসিক চ্যুতির অপরাধে স্বামীর আদেশে পুত্র পরশুরাম তাঁকে অনায়াসে হত্যা করতে পারেন। পাণ্ডুর পুত্র আকঙ্খা মেটাতে বারেবারে পরপুরুষের কাছে সহবাস করতে বাধ্য হওয়া কুন্তী মল্লিকার কলমে ধরা দেন একবিংশ শতাব্দীর স্বাধীনচেতা নারী হিসেবে—

"পাঁচটি সন্তান নিয়ে একা একা একা
জঙ্গলমহল থেকে মহানগরীতে
...ভারতবর্ষ জুড়ে সেই ক্রান্তিকালে
উঠে দাঁড়ালেন এক স্বাধীন জন্মী।
বাসেট্রামে কর্পোরেটে বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
আমরা অজস্র কুন্তী বাঁচতে শিখেছি
মহাভারত থেকে একুশ শতক।"[১০]

এছাড়াও মহাভারতের মৌষলপর্বে যদুবংশ ধ্বংসের ফলে ষোলোহাজার নারীর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দীর্ঘযাত্রার চিত্রে কবি তথাকথিত সতীত্বের ফাঁকা অহংকারের পাশে রক্তমাংসের নারীর জৈবিক কামনা-বাসনাকেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ধর্মীয় মোড়কে নারীর জৈবিক কামনা বাসনাকেও যেখানে প্রান্তিকায়িত অপরের চেতনায় মুড়ে রাখে সেখানে নারীচেতনার প্রতিকূল যাত্রাপথে মল্লিকার কবিতার বয়ান অনন্য হয়ে ওঠে—

"স্বামীকে মাত্র একরাত যারা পেয়েছে
ওই দস্যুর চাহ্ত তাদের স্বপ্ন।"[১১]

মনসামঙ্গলের প্রথাগত সতীচরিত্রের একমাত্র হকদার নিঃসন্দেহে বেহুলা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ 'সতীত্ব' নামক স্বর্ণমুদ্রার মোড়কে বাস্তবতাকে অতল সলিলে নিমজ্জিত করে এসেছে প্রতিনিয়ত। বাসররাতে বিধবা হওয়া মেয়েকে অনিশ্চিত যাত্রাপথে ঠেলে দিয়েছে পুরুষতান্ত্রিক ইগোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। মল্লিকার বেহুলারা কালে কালে প্রাসঙ্গিক হয়ে ফুটে উঠে একবিংশ শতাব্দীর সমাজতাত্ত্বিক পটভূমিতেও—

"স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য
ইন্দ্রসভায় কামনামদির নৃত্যে
দেবতার কাছে নিজেকে করল পণ্য
তোমরা সবাই বললে সে সতীলক্ষ্মী
তোমরা জানো না বেহুলা আসলে

ডানা ভাঙা এক বউ-কথা-কও পক্ষী
বাংলার ফুল বাংলার মেয়ে বেভুলা
অপমান ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি আমরা
তুমি আমি আর আমরা সবাই বেহুলা।"[১২]

চিরলাঞ্ছিত রমণীর প্রতীক খনা ঐতিহাসিক চরিত্র। 'খনার বচন' হিসেবে আজও লোকসমাজে সমান গৌরবে মৌখিকভাবে প্রচলিত আছে আবহাওয়া, কৃষিকাজ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ভবিষ্যবাণী। খনার স্বামী মিহির এবং শ্বশুর বরাহমিহির ছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের উজ্জ্বল রত্ন। সেখানে খনার তীক্ষ্ণ ধীশক্তি রাজার দ্বারা প্রশংসিত হলে স্বামী-শ্বশুরের পুরুষতান্ত্রিক ইগো মেনে নিতে পারেনি। একমাত্র নারী হওয়ার অপরাধে নির্মমভাবে জল্লাদের তরোয়াল খনার জিভ কেটে নেয় এবং রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয় খনার। সময় পরিবর্তন হয়েছে, নতুন নতুন আইন এসেছে তবুও একবিংশ শতাব্দীর নারীর প্রকৃত অবস্থানের কোনো বদল হয়নি। স্ময়ের অভিঘাতে এই সময়ের নারীদের সামগ্রিক অবস্থান কবির কলমে ফুটে ওঠে–

"মাঠে পড়ে আজও কাঁদছে আমাদের নারীজিহ্বা..."[১৩]

পিতার পৃথিবীতে মহাকালের নারী যখনই হয়েছে লাঞ্ছিত, অবহেলিত, অত্যাচারিত তখনই আড়ালে আবডালে ফল্গুধারার মতো সঞ্চারিত হয়েছে নারীপরিসর নির্মাণের সংকল্প। এক্ষেত্রে কবি পুরাণের মহীয়সী নারীদের পাশাপাশি ইতিহাস ও সমকালের নারী-যাপনের বর্ণমালাকে একত্র করে নিজেকে তাদের আসনে বসিয়ে অনুভব করেন নারীচেতনার উজ্জ্বল আলোকে–

"আমিই ছিলাম মীরাবাঈ, কৃষ্ণপ্রেমের জন্য কত যে পীড়ন সহ্য করেছি, সে তোমরা জানো। আমি উমরাও জান। কত দৈত্য দানো হেঁটে গেছে আমার জিসম, আমার শরীরের ওপর দিয়ে আর আমি অশ্রুজলে শায়েরি লিখেছি। আমি হারেমবন্দি জাহানারার আত্মকথন। উনিশ শতকে আমি রাসসুন্দরী দেবী, খাটের তলায় গোপনে বসে আত্মকথা লিখতাম। কেউ দেখে ফেললে নিন্দে করবেও যে! আমিই মহাশ্বেতা, কোনও প্রতিকূলতাই যার লেখনিকে আটকে রাখতে পারে না। আমি খনা, নিষ্ঠুর সমাজ যার জিভ কেটে নেয় সত্য বলার অপরাধে।"[১৪]

ইতিহাসখ্যাত সুলতানা রিজিয়াকে কে না জানে, যার বয়ানে উঠে আসে নির্মম সত্যভাষণ–

"ভারতবর্ষের মেয়েরা কোনওদিন রাজা হয়নি। প্রজাও হয়নি। হয়েছে রাজার বউ আর প্রজার বউ। সুয়োরানি দুয়োরানি আর ঘুঁটেকুড়ানি। একবার, শুধু একবার রাজা হয়েছিলাম, মাত্র কয়েকদিনের জন্য আমি কথামানবী, হয়ে উঠেছিলাম সুলতানা রিজিয়া।"[১৫]

কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদ টেনে হিঁচড়ে আলদা করল নারী আর সিংহাসন। পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতির হাতে অকালে বলি হতে হয় ইতিহাসের রিজিয়ার পাশাপাশি আজকের রিজিয়াদের।

গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কবলে পড়ে আব্রু কিংবা বসন-ভূষণ হারনো এক গুর্জরি মুসলিম মেয়ের বয়ান প্রতিটি মানবিক চেতনাসম্পন্ন পাঠকের চোখে নিয়ে আসে বেদনাশ্রু। ত্রিশূলধারী গৈরিক দাপটে মহিলা, শিশু সকলেই গণধর্ষণ কিংবা গণহত্যা কিংবা গণলুণ্ঠনের শিকার হয়। বাদ পড়েনি কন্যাসমা মেয়ে কিংবা গর্ভবতী মহিলাও। ধর্মের নামে, রাজনীতির নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পুড়তে থাকে হিন্দু ও মুসলমানের নগর ও দেবালয়। গণধর্ষণের দেশে সেই গুর্জরি মুসলিম মহিলার আত্মবয়ানে মল্লিকা সচেতন বিবেকের অস্তিত্বের বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন–

"বেঁচে আছি এ কোন দেশে!
বেঁচে আছি, সত্যি নাকি!"[১৬]

পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদ তথা ইসলামিক শরিয়তি বিধানের কাছে মুখ লুকিয়ে কাঁদে আজও শাহবানু, ইমরানার মতো অসংখ্য নারী। ১৯৮৫ সালে শাহাবানু কেস মোল্লাতন্ত্রের চূড়ান্ত অমানবিকতার উদাহরণ। তালাক-সুদা শাহাবানু দুমুঠো অন্ন(খোরপোশ) আদায়ের জন্য শেষপর্যন্ত সুপ্রিমকোর্টের কাছে ন্যায় বিচার পায়। কিন্তু ভোট-রাজনীতির নোংরা মানসিকতার কাছে বিচারের সেই বাণী নিভৃতে কাঁদে আজও। কবি শাহাবানুর

প্রতিনিধিত্বে যেমন উন্মোচিত করেছেন শরিয়তি বিধানের সংকীর্ণ রাজনীতিকে তেমনই উচ্চ-বিচারালয়ের সাম্মানিক স্বীকৃতির মধ্যে লালন করেছেন নারীচেতনার বীজ। শাহাবানু ছাড়াও ইমরানার বয়ানে আরো ভয়ংকর ভাবে চিত্রিত হয় মোল্লাতন্ত্রের নির্মম পাশবিকতার অন্যদিক। শ্বশুরমশাইয়ের জৈবিক প্রবৃত্তিতে পুত্রবধূকে হয়ে হয় ধর্ষিত। ইসলামিক বিধানে ধর্ষণকারীর একমাত্র শাস্তি কঠোর মৃত্যু। অথচ পুরুষতান্ত্রিক মৌলবাদ ইমরানাকে উপযুক্ত বিচার দিতে ব্যর্থ। মল্লিকার কবিতায় ইমরানারা মহাকালের পাঠকের কাছে তাঁদের নির্যাতনের উত্তর খুঁজে-

> "দার-উল-উলম ফতোয়া দিলেন
> শাস্তি হবে আমার
> পুরুষের কাজ পুরুষ করেছে, করুক
> এখন থেকে আমার ঘর ধর্ষকের খাটে
> বরের সঙ্গ এখন থেকে বারণ।
> আমদরবার বিচার করুন
> আমি কি এক মাংসটুকরো
> শয়তান এসে চেটেছে বলেই বরবাদ আমি
> আমার ঘর, আমার খসম, সব বরবাদ?
> এই কি আমার শান্তির দেশ ভারতবর্ষ?
> আমি ইমরানা, আপনাদের জবাব চাই।"[১৭]

> "ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর রিপোর্টে কী ভয়ানক সব তথ্য বেরিয়েছে, প্রতি চল্লিশ মিনিটে একটি ধর্ষণ, প্রতি বাইশ মিনিটে একটি যৌননিগ্রহ, প্রতি ১০৬ মিনিটে একটি যৌতুকহত্যা—এ কোন দেশে আমরা বাস করছি, এই দেশ কি আমার না?"[১৮]

—'মালতীজন্ম' কবিতার প্রাককথনে মল্লিকার দেওয়া এই তথ্য পুরুষতন্ত্রের কলঙ্ক, ঠিক যেমন 'শ্লীলতাহানির পরে' উপন্যাসে অফিসের বস বিজন কর্তৃক কর্মী রিকির শ্লীলতাহানি, কিংবা রূপান বাজাজ এর মামলা। পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রামের মালতী মুদি স্বয়ং দূর্গা হয়ে অশুররূপী পুরুষতান্ত্রিক পাশবিকতার বুকে পেটে ছুরিকাঘাত করতে সক্ষম হলেও অফিসকর্মী রিকি কিন্তু ততটা ভয়ংকরী নন। দুই ক্ষেত্রেই দুই নারী আইনের কাছে গেছে ন্যায্য বিচার পাবার আশায় কিন্তু পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং রাজনৈতিক জটিল সমীকরণ মালতীদের প্রতিহত করার জন্য উঠে পরে লাগে। শুধু তাই নয় জীবনযুদ্ধের এই অসময় লড়াইয়ে নিজের জন্মদাতা বাবা-মাও যখন তাদের বিরূপ হয়ে ওঠে মালতীদের মনন-মানসিকতা নির্মাণ করে নারীচেতনার বিকল্প বয়ান—

> "মালতী ভাঙবে, মচকাবে না
> ...মালতী একাই বাঁচতে চেয়েছে
> মানসম্মানে বাঁচার জন্য
> ... মালতী শুধু বাঁচতে চেয়েছে
> আগুনের মতো বাঁচা।"[১৯]

'পুলিশি অন্ধ আইন' ইটভাটার বাবুকে কিংবা বিজনকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে ব্যর্থ হলেও নারীচেতনার উত্তরনারীর কাছে মালতী কিংবা রিকি দুজনেই আদর্শ রোলমডেল চরিত্র।

মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিমননের সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কবি বল্লরী সেনের মূলবান অভিমত এক্ষেত্রে প্রাণিধানযোগ্য—

> "কন্যাভ্রূণ হত্যা, গার্হস্থ্য নির্যাতন, স্ত্রীকে বলাৎকার কিংবা সমাজের অসহায় বালিকার শোষণপ্রণালী জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা বৈ তো নয়। কিন্তু তার মধ্যেই মল্লিকার কবিসত্তা তাঁর নিগূঢ় স্বকালের কান্না শুনতে পেয়েছে। নারী-মনস্তত্ত্বের ভাষ্যরচনা থেকে শুরু করে সেই প্রলেতারিয়েত্ মেয়েটির জীবন-সংগ্রামকে লেখায় রূপ দিলেন কবি। নির্মাণ করলেন এক অভিনব ফেমিনিস্ট ম্যানিফেস্টো— বৈষম্য নয়, সুস্থ মানবিক সম্পর্কের পারস্পরিকতায় গড়ে-ওঠা মানবী-বিশ্ব : যেখানে মেয়েটি তার অসহায়তা নয়, কার্যক্ষমতা-সক্রিয়তা ও সাহস নিয়ে সমস্ত

প্রতিবিধানকে যাচাই করে দেখবে, বিচার করে দেখবে পুরাণকে আর পুরুষকারের ভণ্ডামিকে মিথ্যা প্রমাণ করে এক সম্পূর্ণ মানুষকেই প্রতিষ্ঠিত করবে ভালবাসা-স্বপ্ন ও অনুরাগে।"[২০]

অসুরদের দমন করতে যখন তেত্রিশকোটি দেবতা ব্যর্থ তখন সম্মিলিত দেবতার প্রয়াসে গড়ে তোলা হয় নারীশক্তি দশভূজা দুর্গাকে। একমাত্র দূর্গার হাতেই যাবতীয় অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটেছিল সেদিন। অথচ আমাদের প্রচলিত ধর্মীয় ভাবনা এতটাই পুরুষতন্ত্রের কুক্ষিগত যে, সেই দুর্গার পুজোতে একছত্রভাবে পৌরহিত্য করেছে পুরুষ। নারী আজও বঞ্চিত সেখানে। মল্লিকা সেনগুপ্ত প্রতিটি নারীর মধ্যে দুর্গাকে দেখেন। 'আমার দুর্গা' শিরোনামাঙ্কিত কবিতার অন্তর্গত 'প্রার্থনা শ্লোক', 'বন্দনা শ্লোক', 'আবাহন শ্লোক', 'শৃঙ্গার শ্লোক', 'ইতরজনের শ্লোক', 'গৃহিণীর শ্লোক', 'কন্যা শ্লোক'—পৃথক পৃথক উপ-শিরোনামে দুর্গারূপী নারীরা মহাকালের এবং উত্তরকালের নারীর পুজোতে যেন পৌরহিত্য করে চেয়েছে। সর্বশক্তিরূপে উত্তরকালের নারী দুর্গা সোরেন রূপে অঙ্কের স্যারের নোংরা হাতটা মুচড়ে দিতে পারে অনায়সে। তাই কবি স্তুতি করেন তাঁর কবিতার দূর্গাদের –

"বিশ্বায়নে পণ্যায়নে খণ্ডখণ্ড মানচিত্রে বাংলা-বিহার-রাজস্থানে সাধারণী নমস্তুতে
বেশ্যাব্রতে পত্নীব্রতে মোহমুদ্রা ধ্বংসমুদ্রা প্রযুক্তিতে গৃহকর্মে সাধারণী নমস্তুতে।।"[২১]

পুরাণ ইতিহাসের পথ বেয়ে এই নারীরা একবিংশ শতাব্দীর বৃহত্তর সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট পরিক্রমা করে তাদের নিজস্ব পরিসর নির্মাণে করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পুরুষতান্ত্রিক জটিল আবর্তের মাঝেও আজকের প্রতিটি স্বাধীনচেতা নারী মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় নবকলেবরে আত্মপ্রকাশ করে—এখানেই মল্লিকার স্বার্থকতা। মহাকালের জটিল প্রবাহে শক্তিরূপী দুর্গারা এভাবেই চক্রাকারে আবর্তিত হয় উত্তরকালের নারীর হাত ধরে—

"আমার দুর্গা পথে প্রান্তরে ইস্কুলঘরে থাকে
আমার দুর্গা বিপদে আপদে আমাকে মা বলে ডাকে
আমার দুর্গা আত্মরক্ষা, শরীর পুড়বে, মন না
আমার দুর্গা নারীগর্ভের রক্তমাংস কন্যা
আমার দুর্গা গোলগাল মেয়ে, আমার দুর্গা তন্বী
আমার দুর্গা কখনও ঘরোয়া কখনও আগুন বহ্নি
আমার দুর্গা মেধা পাটেকর, তিস্তা শীতলাবাদেরা
আমার দুর্গা মোম হয়ে জ্বালে অমাবস্যার আঁধেরা
আমার দুর্গা মণিপুর জুড়ে নগ্ন মিছিলে হাঁটে
আমার দুর্গা কাস্তে হাতুড়ি আউশ ধানের মাঠে
আমার দুর্গা ত্রিশূল ধরেছে স্বর্গে এবং মর্ত্যে
আমার দুর্গা বাঁচতে শিখেছে নিজেই নিজের শর্তে।"[২২]

তথ্যসূত্র:

১. সেনগুপ্ত, মল্লিকা। 'কবিতাসমগ্র' সম্পাদনা- সুবোধ সরকার। 'কথামানবী'/নান্দীমুখ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭০০০০৯, জুলাই ২০১৬, পৃ. ২০৬।
২. তদেব, রামরাজ্য, পৃ. ২৯২।
৩. সেনগুপ্ত, মল্লিকা। 'গদ্যসমগ্র' সম্পাদনা- সুবোধ সরকার। 'সীতায়ন' আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭০০০০৯, আগস্ট ২০১২, পৃ. ১১৬-১১৭।
৪. সেনগুপ্ত, মল্লিকা। 'কবিতাসমগ্র' সম্পাদনা- সুবোধ সরকার। 'দ্রোপদীজন্ম' আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭০০০০৯, জুলাই ২০১৬, পৃ. ২০৭-২০৯।
৫. তদেব, দ্রোপদীজন্ম, পৃ. ২০৯।
৬. তদেব, মাধবীজন্ম, (প্রাক্‌কথন) পৃ. ২২৮।
৭. তদেব, আমার লাস্য আমার লড়াই/মাধবীর গান, পৃ. ২৮৯।
৮. তদেব, গঙ্গাজন্ম, পৃ.২১৫।

৯. তদেব, পৃ. ২১৫।
১০. তদেব, কুন্তী রিভিজিটেড, পৃ. ৫৬৩।
১১. তদেব, মৌষল পর্বের মেয়েরা, পৃ. ১৯১।
১২. তদেব, বেহুলা, পৃ. ৩৫৩।
১৩. তদেব, খনাজন্ম, পৃ. ২৫০।
১৪. তদেব, খনাজন্ম, (প্রাক্‌কথন) পৃ. ২৪৪।
১৫. তদেব, রিজিয়াজন্ম, (প্রাক্‌কথন) পৃ. ২১৬।
১৬. তদেব, আমি গুর্জরি মুসলিম মেয়ে, পৃ. ৩২৩।
১৭. তদেব, আমি ইমরানা, পৃ. ৪৩৩।
১৮. তদেব, মালতীজন্ম, (প্রাক্‌কথন) পৃ. ২৩২।
১৯. তদেব, মালতীজন্ম, পৃ. ২৩৮।
২০. মন্ডল, অধীরকৃষ্ণ সম্পাদক, বনানী, বল্লরী সেন/মল্লিকা সেনগুপ্ত : অন্য এক নারী-বিশ্ব, জানুয়ারী-মার্চ ২০১৪।
২১. সেনগুপ্ত, মল্লিকা। 'কবিতাসমগ্র' সম্পাদনা- সুবোধ সরকার। আমার দুর্গা/কন্যাশ্লোক, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭০০০০৯, জুলাই ২০১৬, পৃ: ৪০৯
২২. তদেব, পৃ. ৪১০।